শেষ পর্যন্তও

সানজিদা সিদ্দিকী কথা

সিয়ান পাবলিকেশন লিমিটেড

***

মিতু অনেক্ষণ হয় এই রুমটাতে বসে আছে। এটা ওর বাসরঘর। রাসেল এখনো রুমে আসেনি। মিতুকে ওর শ্বশুরবাড়ি পক্ষের ভাবিরা এখানে বসিয়ে রেখে গেছে। এদের ওপর মিতু বেশ বিরক্ত। কীসব দুষ্টু ইঙ্গিত করছিল। বাসররাতে বিয়ের কন্যার সাথে অসভ্য সব ঠাট্টা-মশকারা করা—ভাবিশ্রেণির মানুষদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটা নিয়ম। এই নিয়ম রক্ষা করা অপরিহার্য। রাজন নামে মিতুর একটা দেবর আছে, অনার্সে পড়ে। মিতু ঠিক করেছে রাজনের বিয়ের সময় এই কঠিন নিয়ম সে ভঙ্গ করবে। রাসেলরা দুই ভাই। এসব ভাবিরা ওর কাজিনদের বউ।

মিতুর বেশ ঘুম পাচ্ছে; কিন্তু ঘুমানো যাবে না। রাসেল এসে যদি দেখে নতুন বউ ঘুমাচ্ছে, বিশ্রী ব্যাপার হবে। ঘরজুড়ে ফুলের গন্ধ। ড্রেসিং টেবিলের ওপরে একটা ফুলদানিতে দোলনচাঁপা সাজানো আছে। খুব সুন্দর গন্ধ আসার কথা থাকলেও তেমন একটা আসছে না; কারণ, ঘরে গাঁদাফুল আর রজনীগন্ধার গন্ধ। মিতুর কাছে গাঁদা আর রজনীগন্ধার গন্ধ খুব বাজে লাগে। ওর ইচ্ছা করছে সামনের জানালা দিয়ে এই ফুলগুলো ফেলে দিতে। শুধু দোলনচাঁপার গন্ধ থাকবে রুমজুড়ে; কিন্তু ইচ্ছে করলেই তো আর হবে না। জীবনে মানুষের বেশির ভাগ ইচ্ছাই পূরণ হয় না। দুনিয়া ইচ্ছা পূরণের জায়গা না, পরীক্ষার জায়গা। এটাই নিয়ম। মাঝেমধ্যে হঠাৎ করে দুই-একটা ইচ্ছা পূরণ হয়ে যায়। এই যেমন মিতুর খুব ইচ্ছা ছিল ওর বিয়েটা খুব সাধারণ হবে। বড়জোর ৫০ জন মানুষ উপস্থিত থাকবে; কিন্তু সেটা হলো না। মিতুর অন্তরে বদ্ধমূল ধারণা যে, সাধারণ বিয়ের দম্পতিরাই অসাধারণ সুখী-জীবন যাপন করে। এর মধ্যে কী অদৃশ্য সূত্র কাজ করে, তা

মিতু জানে না।

মিতুর বাবা বেলায়েত সাহেব সরকারি স্কুলের হেডমাস্টার হলেও একমাত্র মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন খুব ধুমধাম করে। এমন মোটেও না যে বেলায়েত সাহেবের খুব টাকা-পয়সা আছে। মিতুর যখন বিয়ে ঠিক হয়ে যায়, সে তার বাবাকে নিজের ইচ্ছার কথা বলেছিল। তাদের মধ্যে কথোপকথন অনেকটা এরকম হয়েছিল—

-বাবা আমি কি একটা কথা বলতে পারি?

-আমি কি কোনোদিন তোমাকে কোনো কথা বলতে নিষেধ করেছি?

মিতুর বাবা রাগী মানুষ। এই কথা শোনার সাথে সাথে মিতুর গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেল।

-চুপ করে আছ কেন মিতালী রহমান!

মিতুর বাবা সিরিয়াস সময়গুলোতে ওকে আসল নামে ডাকে।

-বাবা, মায়ের কাছে শুনলাম বিয়েতে নাকি অনেক মানুষ দাওয়াত দেওয়া হচ্ছে। কম্যুনিটি সেন্টার ভাড়া করা হবে। বলতে চাচ্ছিলাম এটা না করলে হয় না বাবা, প্লিজ! খুব অল্প কিছু মানুষ মিলে অনুষ্ঠানটা করে ফেললে তুমি কি বেশি কষ্ট পাবে, বাবা?

-মিতু, দিন-দিন যে তুমি খুব নির্লজ্জ টাইপ মেয়েতে পরিণত হচ্ছ, সেটা কি তুমি জানো? আমি জীবনে কোনোদিন দেখিনি কোনো মেয়ে এত নির্লজ্জের মতো নিজের বিয়ে নিয়ে কথা বলে! আমি মাঝে মাঝে আশ্চর্য হয়ে যাই তুমি আমার কন্যা হয়ে!

-রেবেকা, এই রেবেকা।

মিতুর মা সামনে এসে দাঁড়াল।

-তোমার নির্লজ্জ মেয়েকে বলো এখান থেকে যেতে। গিয়ে ওর যত বন্ধুবান্ধব আছে তাদের একটা লিস্ট তৈরি করে আমাকে দিতে। কেউ যেন বাদ না যায়। এরা সবাই গায়ে হলুদে একটা করে শাড়ি পাবে। ওইদিন আব্দুর রহিমের মেয়ের গায়ে হলুদে দেখলাম মেয়েরা সবাই এক রকম শাড়ি পরেছে। মিতুর বিয়েতেও এরকম হবে।

মিতু কিছুতেই ধরতে পারছে না বাবা এর মধ্যে নির্লজ্জতা কোথায় খুঁজে পেল। মিতুর খুব অভিমান লাগছে ওর বাবার ওপর। যেসব আয়োজন হচ্ছে তার মধ্যে ও নিজেকে কিছুতেই খুঁজে পাচ্ছে না।

বাবা তার ইচ্ছামতোই বিয়ের অনুষ্ঠান করেছে। শুধু আজকে যখন মিতু কম্যুনিটি সেন্টার

থেকে চলে আসছিল গাড়িতে করে তখন বেলায়েত সাহেবকে কোথাও খুঁজে পাওয়া যায়নি। কঠিন ধরনের মানুষেরা চোখের পানি অন্যের সামনে দেখানোকে অপরাধের পর্যায়ে দেখেন। বেলায়েত সাহেব নিজে স্টেজে উঠে মা-মেয়েকে বলে গিয়েছিলেন কেউ কোনো কান্নাকাটি করবে না। নো কান্নাকাটি। পৃথিবীতে মিতু একমাত্র মেয়ে না যার বিয়ে হচ্ছে। মিতু কাঁদেনি। রেবেকা মেয়েকে ধরে যখন অঝোর ধারায় কাঁদছিল, মিতু পাথরের মতো মুখ করে ওর বাবাকে খুঁজছিল। বেলায়েত সাহেব বড় কালো রঙের একটা পাজেরো গাড়ির পেছনে দাঁড়িয়ে পকেট থেকে রুমাল বের করে চোখের পানি মুছছিলেন। স্কুলের আরেক টিচার সামনে পড়ে যাওয়াতে তড়িঘড়ি করে বলে উঠলেন, চোখে কী যেন গেল, বুঝালেন জনাব চোখে কী যেন গেল!

***

মিতু যে রুমটাতে বসে আছে, সেটার জানালা খোলা। মাঘ মাসের শীতে কনকন করে ঠান্ডা হাওয়া আসছে; কিন্তু ওর বেশ ভালো লাগছে। ওর খুব ইচ্ছে করছে আইসক্রিম খেতে। মাঝে মাঝেই শীতের রাতে ওর খুব আইসক্রিম খেতে ইচ্ছে করে।

বিয়ের শাড়িটা অসম্ভব ভারী। মিতু বদলে ফেলার জন্য স্যুটকেস খোলার চেষ্টা করে ক্লান্ত। যে চাবিটা দিয়ে ও খোলার চেষ্টা করছে, সেটা স্যুটকেসের তালার মধ্যে ঢুকলেও কিছুতেই ঘুরছে না।

দরজা খুলে রাসেল ভেতরে ঢুকল। ক্যাঁচক্যাঁচ শব্দ হলো। দরজার শব্দে রাসেলকে বেশ লজ্জিত মনে হলো।

-কী বাজে শব্দ দরজাটার।

মিতু হাসিমুখে বলল।

-আচ্ছা, তুমি কি অল্প একটু সয়াবিন তেল আনতে পারবে রান্নাঘর থেকে? দরজার শব্দটা বন্ধ করা দরকার।

-তার আগে একটা কাজ করো, আমার স্যুটকেসটা খুলতে পারছি না। এটা একটু খুলে দাও। চাবি ঢোকে ঠিকই; কিন্তু ঘোরে না। কী যে এক যন্ত্রণায় পড়লাম!

রাসেল স্যুটকেসের দিকে এগোতে এগোতে বলল, অবশ্যই অবশ্যই; আর সাথে সাথে সাইড টেবিলের সাথে পা বাঁধিয়ে উলটে পড়ে গেল। পড়ল খুব বেকায়দা ভঙ্গিতে। কীভাবে জানি পা দুইটা ওপরে তুলে মাথাটা নিচে নেমে গেল।

মিতু খিলখিল করে হেসে উঠল।

-আমি খুবই দুঃখিত। আমার খুব হাসি পেয়ে গেল তাই হেসে ফেললাম।

মিতু এসে রাসেলকে টেনে উঠাল। মিতু ধরাতে মনে হলো রাসেল বেশ লজ্জা পেয়েছে।

-তুমি কি লজ্জা পাচ্ছ? আমি কিন্তু আজ থেকে তোমার দেনমোহর উসুল করা বউ। যদিও আমরা কেউ কাউকে ওভাবে চিনতাম না। তাতে কী আছে! আমার রহস্য ভালো লাগে।

রাসেল স্যুটকেসের চাবি দিয়ে তালা খুলতে গিয়ে পুরো চাবি ভেতরে থাকা অবস্থায় হাতল ভেঙে ফেলল। এরপর বোকা বোকা চোখে মিতুর দিকে তাকিয়ে থাকল।

রাসেলের বোকা বোকা চেহারা দেখে কেন জানি মিতুর খুব মায়া লেগে গেল।

-তুমি এখন যে কাজটা করবে সেটা হলো, সয়াবিন তেল নিয়ে আসার সময় একটা হাতুড়িও নিয়ে আসবে। আমি স্যুটকেসের তালা ভেঙে ফেলব।

রাসেল সয়াবিন তেল আর হাতুড়ি নিয়ে ফেরত এলো প্রায় আধা ঘণ্টা পর। সাথে করে পেপার দিয়ে মোড়ানো বোতলের মতো কী জানি একটা জিনিসও এনেছে। বাসায় কোথাও হাতুড়ি খুঁজে না পাওয়াতে ও খানিকটা দূরে গিয়েছিল। ওখানকার বস্তিতে এক পরিচিত মুচি থাকে। এত রাতে সেখানে উপস্থিত হওয়াতে মুচি বেচারা বেশ হকচকিয়ে গেলেও হাতুড়ি চাইতেই কথা না বাড়িয়ে দিয়ে দিল। রাসেল দ্রুত বাসায় ফিরে এলো।

***

-আচ্ছা তুমি কি জানো ছেলে হিসেবে তুমি খুব ভাগ্যবান!

-কী কারণে?

-এই যে তুমি আমাকে বৌ হিসেবে পেয়েছ এই কারণে। আমি কিন্তু মেয়ে হিসেবে খুব ভালো। আর এটা জানো মিতু নামের মেয়েরা খুব সংসারী হয়। আমার দিকে ভালোমতো তাকাও তো, আমাকে দেখে কি মনে হচ্ছে না আমার মধ্যে মায়াভাব প্রবল?

রাসেল মুচকি হাসছে। ওর সত্যিই মনে হচ্ছিল এই আধ পাগলা টাইপ মেয়েটা ওর জীবনকে আর যাইহোক, কখনো একঘেয়ে হতে দেবে না।

-তুমি আমার জন্য কোনো গিফট এনেছ? বিয়ের রাতে সব স্বামীই নতুন বউকে উপহার দেয়। এটাই তো নিয়ম, তাই না?

-গিফট একটা এনেছি। এর জন্য অন্ধকারে যাওয়া লাগবে। চলো বারান্দায় যাই।

রাসেল বারান্দায় গিয়ে পেপার দিয়ে মোড়ানো জিনিসটা বের করল।

একটা কাচের জারভর্তি জোনাকিপোকা। কী সুন্দর!

মিতুর চোখে সাথে সাথে পানি চলে এলো। এমন অদ্ভুত সুন্দর উপহার সে বিয়ের রাতে পাবে ভাবতেও পারেনি। ও মনে হয় পৃথিবীর একমাত্র মেয়ে, যাকে তার স্বামী বিয়ের রাতে একটা কাচের জারভর্তি জোনাকিপোকা উপহার দিয়েছে। এই মুহূর্তে ওর নিজেকে পৃথিবীর সবচেয়ে সুখী মেয়ে মনে হচ্ছে।

***

রান্নাঘরে ঝনঝন শব্দে কিছু ভাঙল আর মিতুও সাত বছর আগের ওর বিয়ের রাতের স্মৃতি রোমন্থন থেকে বাস্তবে ফিরে এলো। মনে হয় টুনটুনি কিছু ভেঙেছে। টুনটুনি মিতুর বড় মেয়ে। ওর বয়স ছয় বছর।

-এই টুনটুনি কীসের শব্দরে!

টুনটুনির পা কেটে গেছে। ওর নিউটেলা খুব পছন্দ। ভাত খেতে তার ইচ্ছে না করলেও সারা দিনে স্কুল বাদে যতক্ষণ বাসায় থাকে, একটু পর পর পাউরুটিতে নিউটেলা লাগিয়ে খায়; বোন রিনিকেও দেয় একটু-আধটু। সেই নিউটেলার বোতল ভেঙেই এখন এই দশা। রিনি ওর থেকে মাত্র এক বছরের ছোট। মিতুর দুইটা বাচ্চা পরপর হয়েছে। দ্বিতীয় মেয়েটা হবার সময় বেশ জটিলতা দেখা দিয়েছিল। রিনি হবার সময় মিতু চিন্তাই করে ফেলেছিল ও আর বাঁচবে না। দুই বাচ্চার কথা ভেবে আতঙ্ক লাগছিল; ভাবছিল মরে গেলে কী হবে। আবার মনে হয়েছিল মরে যাওয়াটাই ভালো হবে; কিন্তু মিতু কীভাবে জানি বেঁচে গেল। ছয় ব্যাগ রক্ত দেওয়া লেগেছিল ওকে। প্রায় চব্বিশ ঘণ্টা আইসিইউতে থাকার পর যখন আল্লাহ ওকে বাঁচিয়ে দিলেন, তখন ডক্টর এসে যুদ্ধজয়ের ভঙ্গিতে রাসেলকে বলেছিল, আপানার স্ত্রী এখন বিপদমুক্ত। এটা অবশ্যই একটা মিরাকল যে আপনার স্ত্রী ও কন্যা দুজনই সুস্থ আছে। রাসেল এটা শুনে হসপিটালের সবাইকে মিষ্টি খাইয়েছিল। যদিও মিতু এই খবর জানে না। ওর শুধু চোখের সামনে ভাসে মৃত্যুর মুখ থেকে ফেরার পর রাসেলের ভাবলেশহীন মুখ, যেন মিতু মরে গেলেও তার তেমন কিছু এসে যেত না। মিতু অন্য দিকে মুখ ফিরিয়ে কেঁদে ফেলেছিল। এর পর যখন মিতুর ফুপু শাশুড়ি এসে বললেন, 'আবারও মেয়ে! থাক দুঃখ পেয়ো না, এখনকার যুগে ছেলে-মেয়ে সবই সমান!'

তখন মিতুর মনে হয়েছিল মরে গেলেই ভালো হতো। ও কী করতে পারে আবার মেয়ে হলে! আর ও কি কাউকে বলেছে আবার মেয়ে হয়েছে বলে ও দুঃখ পেয়েছে! যদিও মিতুর শাশুড়ি এই বিষয়ে ওকে পুরোপুরি সাপোর্ট দিয়েছে।

টুনটুনির পা অনেকখানি কেটে গেছে। কিছুতেই রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। কোথায় যেন পড়েছিল চিনি আর চা পাতা দিলে রক্ত বন্ধ হয়। মিতু সেটাই করল, এরপরেও লাভ হচ্ছে না। টুনটুনির রক্ত দেখে রিনি চিৎকার করে কাঁদছে; কিন্তু টুনু কোনো শব্দ করছে না। মিতু ওকে আদর করে টুনু ডাকে। ওর শুধু চোখ দিয়ে পানি পড়ছে। ওরা দুই বোন হয়েছে পুরোপুরি দুইরকম। বড়টা কোনো কিছু চায় না, তেমন একটা জ্বালাতনও করে না, খুব জোরে ব্যথা পেলে ওর শুধু চোখ দিয়ে পানি পড়ে, কিছু বলে না। আর রিনি হলে এতক্ষণে পুরো বাড়ি মাথায় উঠিয়ে ফেলত।

-টুনু, বেশি কষ্ট হচ্ছে মা?

-অল্প কষ্ট হচ্ছে মা।

-তোকে হাসপাতালে নেওয়া লাগবে মনে হচ্ছে। তুই কি ভয় পাচ্ছিস?

-না, মা।

মিতু টুনুর পায়ে শক্ত করে কাপড় বেঁধে রাসেলকে ফোন দিল।

-এই তুমি কি একটু আসতে পারবে? টুনটুনির পা কেটে গেছে, কিছুতেই রক্ত বন্ধ হচ্ছে না। কী করব কিছু বুঝতে পারছি না। মনে হয় হাসপাতালে নেওয়া লাগবে।

-তুমি ব্যবস্থা করো। অফিস থেকে বের হতে বললেই তো আর বের হওয়া যায় না।

-আশ্চর্য! তোমার তো বছরে ছুটিও পাওনা থাকে। অফিসও তেমন একটা দূরে না। রিকশা নিলে দশ মিনিটও লাগে না। মানুষের বিপদ-আপদ তো হতেই পারে, তাই না! যাইহোক, তোমার সাথে তর্ক করা বৃথা।

মিতু ফোন নামিয়ে রাখল। ওর শ্বশুর-শাশুড়ি পাশের ফ্ল্যাটেই থাকে। রাসেলের বাবার এই বিল্ডিংটাতে চারটা ফ্ল্যাট আছে। ডেভেলপারকে জায়গা দিয়ে দেওয়াতে চারটা ফ্ল্যাট পেয়েছিলেন। দুইটা দুই ছেলেকে দিয়েছেন, রাজন বিয়ে করেনি বলে ওরটা ভাড়া দেওয়া হয়েছে, অন্যটায় নিজে থাকেন। মিতু রিনিকে ওই বাসায় দিয়ে রাজন থাকলে ওকে নিয়ে মোড়ের হাসপাতালটাতে যাবে।

ভাগ্য ভালো রাজন বাসাতেই ছিল। রাজন আর মিতু টুনটুনিকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে

নিয়ে গেল।

ইমার্জেন্সিতে যে ডক্টর টুনটুনির কাটা জায়গা সেলাই করে দিল, সে ওর সাথে টুকটাক গল্প করছিল যেন মাইন্ড অন্যদিকে ডাইভার্ট হয়। ডাক্তার মেয়েটিকে মিতুর খুব পছন্দ হলো।

-আম্মু তোমার নাম কী?

-টুনটুনি।

ও ফুঁপিয়ে উঠল কিছুটা ব্যথায়।

-তুমি কোন ক্লাসে পড়ো টুনটুনি? তোমার নামটা ভারি সুন্দর, জানো তুমি?

-এই নামটা আমার মা রেখেছে। মা আমাকে আদর করে টুনু ডাকে আর বাবা ডাকে টুনি। আমি স্ট্যান্ডার্ড ওয়ানে পড়ি। তুমি কি ডাক্তার?

-হুঁ, আমি ডাক্তার।

-তোমার এপ্রোন কই তাহলে? ডাক্তারদের গায়ে তো সাদা রঙের এপ্রোন থাকে আমি দেখেছি।

-আমার এপ্রোন চেয়ারের ওপরে খুলে রেখেছি। ওই দেখো।

ডাক্তার মেয়েটি শেষ গিঁটটু দিয়ে দিল।

-ব্যথা লেগেছে আম্মু?

-অল্প একটু লেগেছে। আচ্ছা, আমি কি কাল স্কুলে যেতে পারব ডাক্তার আন্টি?

-আমার মনে হয় দুই দিন পরে গেলে ভালো হবে। রাতে ঘুম থেকে ওঠার পর অল্প একটু ব্যথা হতে পারে।

-আচ্ছা।

***

রাসেল বাসায় এলো রাত এগারোটায়। প্রতিদিন সে চিন্তা করে, মিতু চোখে কাজল দিয়ে ওর জন্য অপেক্ষা করবে। রাসেলের কাজল খুব ভালো লাগে। যদিও কখনো মিতুকে সে কথাটা বলেনি। মিতুর গায়ের রঙ শ্যামলা; কিন্তু ভীষণরকম স্নিগ্ধ চেহারা। ওর চুলগুলো একটু লালচে ধাঁচের। রাসেলের বেশ পছন্দ ছিল। মিতু করল কী, কিছুদিন আগে পার্লার গিয়ে সেই চুল কালো মেহেদি করে এলো। রাসেলের মনটা খুব খারাপ হয়ে গিয়েছিল।